স্মার্ট বাংলাদেশ:রূপ কথা নয়,বাস্তবতার পথে চলা

ইমদাদ ইসলাম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন রাঙামাটি জেলার বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম স্যাটেলাইট আর্থ স্টেশন স্থাপন করেন। যার মাধ্যমে বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। ২০০৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী এবং প্রেরণাদায়ী অঙ্গীকার ঘোষণা করেন ডিজিটাল বাংলাদেশ । অনেকের কাছে তখন অবাস্তব মনে হলেও দেশের যুব সমাজ এটিকে লুফে নেয়। তখন লক্ষ্য ছিলো ২০২১ সালের মধ্যে দেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ। সঠিক পরিকল্পনা,বাস্তবায়ন আর মনিটরিং এর মাধ্যমে দেশ হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রসারে বাংলাদেশ আজ বিপ্লব সাধন করছে।অদম্য গতিতে আমারা চলছি তথ্য প্রযুক্তির এক মহাসড়ক ধরে।

২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি টেকসই ও উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেন তাঁর "Striving to Realize the Ideals of My Father" শিরোনামে লেখা প্রবন্ধে। তিনি তাঁর প্রবন্ধটিতে কীভাবে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সাতটি সমস্যার মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা যায়, কীভাবে দেশ ও জাতিকে একটি স্মার্ট স্তরে উন্নীতকরা যায়; দেশের নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, স্বৈরাচার, সন্ত্রাসবাদ এবং চরমপন্থার শৃঙ্খল থেকে জাতিকে মুক্ত করা যায় সর্বোপরি, সকলের জন্য একটি বাসযোগ্য জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা যায় তার উল্লেখ করে ছিলেন।
২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার প্রায় ১৩ বছর পর ৭ এপ্রিল ২০২২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' রূপকল্প বাস্তবায়নের ধারণা দেন। ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলার ঘোষণা দেন । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিকতম পদক্ষেপ হলো "স্মার্ট বাংলাদেশ" গঠন। তিনি 'স্মার্ট বাংলাদেশের" জন্য ৪টা ভিত্তি (১) স্মার্ট সিটিজেন (২) স্মার্ট ইকোনোমি (৩) স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং (৪) স্মার্ট সোসাইটি ঠিক করে দেন।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হলো স্মার্ট সিটিজেন তৈরি করা।যেখানে প্রতিটি নাগরিক হবে স্মার্ট । সবাই প্রতিটি কাজ অনলাইনে করতে শিখবে। এ জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নানা অনুষঙ্গাকে ধারণ করে তরুণদের প্রশিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । ৬৪টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবিশন সেন্টার স্থাপন এবং ১০টি ডিজিটাল ভিলেজ স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। ৯২টি হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের নির্মাণ করা হচ্ছে। সারাদেশে ছয় হাজার ৬৮৬টি ডিজিটাল সেন্টার এবং ১৩ হাজারের বেশি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগোপযোগি শিক্ষা চালুর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্মার্ট সিটিজেন তৈরির পাশাপাশি স্মার্ট ইকোনমি সিস্টেম চালু করতে হবে। ইকোনমি হবে ই-ইকোনমি। যাতে সর্ম্পূণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ডিভাইসে সম্পূর্ণ হবে। কারিগরি ও প্রযুক্তির উন্নতির কারণে মানুষের ক্ষমতা অসম্ভব বেড়েছে। গত ১৫ বছরে আর্থিক খাতে নীরব বিপ্লব ঘটেছে। ব্যাংক খাতে অনেক ধরনের সেবা বেড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এটিএম (অটোমেটেড টেলার মেশিন), সিডিএম (ক্যাশ ডিপোজিট মেশিন), সিআরএম (ক্যাশ রিসাইক্লিং মেশিন) এজেন্ট ব্যাংকিং, বিইএফটিএন (বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক), এনপিএসবি (ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ) কিউআর কোড, বিনিময় ইত্যাদি। ১৫ থেকে ২০ বছরে এই পরিবর্তনগুলো এসেছে। এভাবে বাংলাদেশ ক্যাশবিহীন লেনদেনের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের নিরক্ষর মানুষটিও যেভাবে একটি মুঠোফোনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারেন, অনেক দেশে এখনো তা অকল্পনীয়। আমাদের এখানে অনেকেই এমএফএস (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস) ও ডিএফএস (ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস) সেবা দিচ্ছেন। কয়েক বছর ধরেই মানুষ ব্যাপকভাবে মোবাইল আর্থিক সেবা গ্রহণ করছেন। আর্থিক সেবার উন্নয়ন করতে ব্যাংকিং খাতের কয়েক দশক সময় লেগেছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ থেকেও বাংলাদেশে মোবাইল আর্থিক সেবা দারুনভাবে সফল হয়েছে। ডিজিটাল লেনদেনে যাওয়ার আর একটা সুবিধা হলো, সব লেনদেনের ইলেকট্রনিক রেকর্ড থাকে। এমএফএসে আগে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ২৯ শতাংশ। এখন এটা ২০ শতাংশ। নারীদের ব্যাংক হিসাবও কমেছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ২০ শতাংশ বেড়েছে। এর কারণ হলো সামাজিক নিরাপত্তা খাত ও পোশাককর্মীদের এমএফএস এই অর্থ দেওয়া। কোভিডের সময় মোবাইল আর্থিক সেবার ব্যাপক প্রসার ঘটে। বাংলাদেশে ডিজিটাল আর্থিক সেবার বিকাশ ঘটেছে একদম সাধারণ মানুষের হাত ধরে। আমাদের গাড়িচালক, শ্রমজীবী মানুষ, গৃহকর্মী তাঁরাই এই সেবাটা প্রথম শুরু করেছিলেন। ২০২৬ সালের মধ্যে শতভাগ মানুষকে আর্থিক অর্ন্তভূক্তির মধ্যে আনার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে। এক যুগ আগে কাউকে টাকা পাঠানো বা পরিসেবার বিল পরিশোধের জন্য লাইনে দাঁড়ানোর বিকল্প ছিল না। তখন কি কেউ ভেবেছিলেন, ঘরে বসে সুবিধাজনক সময়ে এসব আর্থিক সেবা পাওয়া যাবে। আবার ব্যাংকে টাকা জমানো বা ব্যাংক থেকে তাৎক্ষণিক ছোট অঙ্কের ঋণ মিলবে মোবাইল ফোনেই। এখন লাইনের পরিবর্তে নিজের সুবিধাজনক সময়ে ঘরে বসেই মিলছে সব ধরনের ডিজিটাল আর্থিক সেবা। এক যুগ আগে চালু হওয়া মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (এমএফএস) বিকাশ হয়ে উঠেছে এসব সেবা গ্রহণের প্রধান মাধ্যম। ফলে ছোট আর্থিক লেনদেন ও সেবা নিতে ভোগান্তি এখন ইতিহাস। লেনদেন আরও সহজ করতে বেসরকারি

খাতরে ১০টি ব্যাংকে নিয়ে একটি ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নওেয়া হয়ছে। বেসেরকারি খাতরে এই ১০টি ব্যাংকরে উদ্যোগে প্রস্তাবতি এ ব্যাংকরে নাম হবে ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসি।

স্মাট গর্ভনমন্টে: ২০৪১ সালের সরকার ব্যবস্থা হবে অনেকটা "অদৃশ্য সরকার ব্যবস্থা"। মানুষ যেকোন ধরণের সেবা পাবে কোন ধরণের মানুষের প্রত্যক্ষ সহায়তা ব্যতীত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জননিরাপত্তা, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত সেবাসমূহ হবে সম্পূর্ণ পেপারলেস। এখন নানা অ্যাপভিত্তিক সেবা এসেছে। কিন্তু সবাই অ্যাপ ব্যবহার করেন না। ভোক্তাদের জন্যই সেবার সৃষ্টি হয়। ডিজিটাল সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে একজন ভোক্তা কতটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন, সেটা জরুরি। দেশে ডিজিটাল সেবার সংখ্যা দুই হাজার একশতটিরও বেশি এবং দিনদিন ডিজিটাল সেবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অধিকাংশ নাগরিকই কম বেশি ডিজিটাল সেবায় অভ্যস্থ । দেশের সকল নাগরিককে ডিজিটাল সেবায় অভ্যস্থ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।স্মার্ট হেলথ কেয়ার, স্মার্ট ট্যাক্স, স্মার্ট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, স্মার্ট পোস্টাল সার্ভিস, স্মার্ট জুডিশিয়ারি, স্মার্ট বর্ডারস, স্মার্ট সোশ্যাল সেফটি নেট, পুলিশ মডার্নাইজেশন, স্মার্ট যোগাযোগ, ডিজিটাল কানেকটিভিটি এ সেবাগুলো এখন দৃশ্যমান। দেশের মানুষ খুব সহজেই এ সেবাগুলো পাচ্ছে। সরকারি সেবা প্রদানকে দেখা হচ্ছে সেবা গ্রহিতার চোখে, সেবা দাতার চোখে নয়।

স্মাট সোসাইটি: স্মার্ট সোসাইটি বলতে মূলত অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝাবে যেখানে সমাজের সকল শ্রেণির নাগরিক ও টেকসই জীবনযাত্রা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রযুক্তিগত সহনশীলতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি মানবিক বিষয়াদি নাগরিকদের মধ্যে প্রোথিত থাকবে। স্মার্ট সিটির জীবনযাত্রা হবে স্থিতিশীল, প্রাণোচ্ছল যার চালিকাশক্তি আসবে একটি সমন্বিত প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্ম থেকে। বাংলাদেশের জনগণকে বিভিন্ন সেমিনার, প্রশিক্ষণ মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তি মননে ও মেধায় প্রবেশ ঘটিয়ে ক্ষমতায়িত করা হবে। ২০৪১ সালের বাংলাদেশের নাগরিককে সরকারের নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সহায়ক- কার্যকর শক্তি হিসেবে আবির্ভূত করানোই হল স্মার্ট সিটিজেন ধারণার বাস্তবায়নে অন্যতম উদ্দেশ্য। সরকার শহরের সকল সুবিধা গ্রমে পৌঁছে দিচ্ছে। আমাদের শহর ও গ্রমের মধ্যে সুযোগ সুবিধার পার্থক্য দিনদিন কমে আসছ। স্মার্ট সোসাইটিতে পরবিশেবান্ধব র্বজ্য ব্যবস্থাপনা থাকবে। সহৈ সঙ্গে থাকবে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটে ব্যবস্থা। অর্থাৎ নাগরকি সেবার সর্বোচ্চ মানগুলো নিশ্চিত থাকবে ।শহররে আধুনকি উপকরণগুলো গ্রামে পৌঁছে দেওয়া এবং গ্রামের সবুজায়ন শহরে নিয়ে আসা হবে।পরবিশে ও প্রতবিশে সুরক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হবে।

আগামীর বিশ্বে বাংলাদেশ অনেক বিষয়ে বিশ্বকে নতেৃত্ব দেবে। তার আগাম ধারণা কিন্তু বাংলাদশ পুরো বিশ্ববাসীকে দিয়ে রেখেছে। সমসাময়িক সময়েও বাংলাদশে আর্ন্তজাতিক ফোরামে নতেৃত্ব দিচ্ছে, রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আগামীর বাংলাদেশে মেধা ও পরিশ্রমের জয়গান প্রতিষ্টা হবে। তখন শোষণ ও বৈষম্যের জায়গায় দখল করবে সাম্য ও স্বাধীনতা। নাগরিক জীবনের এসব প্রত্যাশা পূরণ করবে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ। যা করতে মানুষের জীবনযাত্রায় হাতের মুঠোয় থাকবে সবকিছু। আর সে পথেই হাঁটছে বাংলাদেশ।

#

পিআইডি ফিচার